অধ্যায় ৮ : বাংলা সাহিত্য অনুবাদ— বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের 'মৃত্যুঞ্জয়' উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের অনুবাদ—১

বিন্যাস ক্রম

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৮.২ পরিচিতি

৮.৩ ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৮.৪ 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

৮.৫ 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্র ভাবনা : অনুদিত গ্রন্থের আলোকে

৮.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

৮.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৮.৮ অতিরিক্ত পঠন

৮.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৮.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশদে জানবেন।

৮.২ পরিচিতি

'মৃত্যুঞ্জয়' উপাধির অর্থ মৃত্যু জয়ী বা অমর। উপন্যাসটি ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসমিয়া সমাজের সংগ্রাম এবং অঙ্গীকারের একটি প্রাণবন্ত চিত্র অঙ্কন করে। এটি বর্ণনা করে কীভাবে অসমিয়া জনগণ ভারত ছাড়ো আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং কীভাবে তারা তাদের রাজ্যে এটি বাস্তবায়ন করেছিল। গল্পটি মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা সৃষ্ট বারপাথর রেললাইনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। এটি অসমিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে আন্দোলনের বিতর্কের প্রতীক, যারা লড়াই করার জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে চায় তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তীব্র অভ্যন্তরীণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে - গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ বা বোসের সহিংসতা বিদ্রোহ। ভট্টাচার্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে, বইটি অসমিয়া দৈনন্দিন

জীবনের পরিবেশ - এর ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং পরিবেশের মাধ্যমে এই রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিকে অন্বেষণ করে। বইটি যখন ১৯৮৯ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত হয়, তখন এর উদ্ধৃতি ভট্টাচার্যকে এর আখ্যান কাঠামোর শক্তির জন্য স্বীকার করে - ড. ভট্টাচার্যকে একজন অসাধারণ লেখক করে তোলে।

৮.৩ ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (১৪ই অক্টোবর ১৯২৪ – ৬ই আগস্ট ১৯৯৮) ছিলেন আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনিই প্রথম অসমীয়া লেখক যিনি দেশের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৮৯) জিতেছিলেন। তিনি কুড়িটি উপন্যাস, ছয়টি ছোটগল্প, প্রায় একশোটি কবিতা এবং অসংখ্য প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেছেন, সেইসাথে বাংলা ও অসমীয়া থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সাহিত্য জগতে আবির্ভূত ঔপন্যাসিক ভট্টাচার্যের প্রধান উপন্যাস গুলোর মধ্যে 'আই', 'ইয়ারুইঙ্গম', 'কবর আরু ফুল', 'নষ্টচন্দ্র','মৃত্যুঞ্জয়', 'প্রতিবাদ' প্রভৃতি প্রধান। তার প্রায় সব উপন্যাসই রাজনৈতিক সুরে লেখা, বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং জনগণের জীবনে এর প্রায়শই অজ্ঞাত পরিণতিকে আশ্রয় করে হয়ে ওঠা। তাঁর কর্মজীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখবো তিনি ১৯৪২ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। অসমীয়া মাসিক পত্রিকা বনহি এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকা 'অ্যাডভান্স'-এর সহ-সম্পাদকরূপে ১৯৪৫-৪৬ সময়ে কাজ করেছেন। ১৯৪৮-৪৯ গুয়াহাটি থেকে দৈনিক অসমিয়া পত্রিকার সংবাদ সম্পাদক বিভাগেও তিনি ছিলেন। সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনতা' (১৯৪৯-৫০)-এর সম্পাদকের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। ১৯৫০-১৯৫২ এই কালপর্বে তিনি মনিপুরের উখরাল উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষকতার কাজে নিজেকে নিয়জিত করেন। মাসিক রামধেনু পত্রিকার সম্পাদকরূপেও নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৬৩-৬৮প্রায় চার বছর তিনি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র নবযুগের সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও তিনি ১৯৬৮ প্রথম রাশিয়া সফর যান। ১৯৬৮-৮৩ সালে ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি-এর সংবাদদাতা নির্বাচিত হন। এরপরে ১৯৮০-৮৩ সালে তিনি আসাম আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট সোসাইটির সভাপতি। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৮সালে *অসমীয়া সাহিত্যে* তাঁর গবেষণার জন্য পিএইচডি উপাধি লাভ করেন। এ সময় তিনি কেরালার এর্নাকুলামে সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত সেমিনারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এর প্রায় দুবছর পর দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। অসমীয়া কথাসাহিত্যের পথিকৃৎ বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য বিষয়ে আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৮.৪ 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

কুড়ি শতকের অসমিয়া সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাস সাহিত্যে বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। উপন্যাসিক ভট্টাচার্যের উপন্যাস অনেকটুকু বামপন্থী আদর্শে রচিত। উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে মুনশিয়ানা, সক্রিয় চিন্তার গাম্ভীর্য এবং মানবতাবোধ লেখাকে তাঁর রচনাকে অন্যমাত্রা প্রদান করে। বীরেন্দ্রকুমারের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা নিবিড় পাঠকের মানসিকতায় গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম। তার উপন্যাসগুলি সমসাময়িক কিংবা পূর্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা নির্ভর হয়ে থাকে। আসাম তথা ভারতবর্ষের মানবজীবনকে যে সমস্ত রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক ঘটনা পরিঘটনা প্রভাবিত করেছে, এমন ঘটনা গুলিকেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন তিনি। ফলে তাঁর উপন্যাসে সমসাময়িক মানবের জীবনযাপন তথা জীবন সংগ্রামের দিক বারবার উন্মোচিত হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ভারতছাড়ো আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাস একাধারে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে এরকম উপন্যাস আমরা দেখি সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায় এবং তার পরবর্তীকালে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ছদ্মবেশে ভারতে আগের ফলশ্রুতিতেভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন মাত্রা পেয়েছিল। তদুপরি ইংরেজরা , ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের ধরে জেলে ভর্তি শুরু করায় দেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিবাদ জোরালো হয়ে উঠলো। এমন অবস্থায় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ৯ই আগস্ট মহাত্মা গান্ধী ডাক দেন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের। তাঁর এই আহ্বানে আসমুদ্রহিমাচলবাসী ভারতীয় সর্বান্তকরণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে। আন্দোলনের রেশ অসমের বিভিন্ন প্রান্তে কীভাবে তার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছিল, এই কথাই বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসের মধ্যে আমরা পাই। ওই সময়ে ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন এর জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী বাহিনী গঠিত হয়েছিল গান্ধীজীর আদছশে। তাঁর আদেশে অসমের বিপ্লবীরাও এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং বিভিন্নভাবে ব্রিটিশদের উৎখাতের প্রয়াসে নিযুক্ত হন। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন মূলত ছিল অহিংস কিন্তু তবুও সেই আন্দোলনে কিছু হিংসাত্মক ঘটনাও সংঘটিত হয়েছিল। কারণ ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সমস্ত নেতৃত্বকে বন্দী করে ফেলেছিল। এই অন্যায়ের ফলে জনসাধারণ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। ব্রিটিশ সরকারের সৈনিকরাও এই বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে নির্বিচারে গণহত্যা, অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার, নারী নির্যাতন প্রভৃতি শুরু করে। এই উপন্যাসে দেখি অবিভক্ত নগাও অঞ্চলে বিদ্রোহ তীব্রভাবে শুরু হয়েছে ও ব্রিটিশ সরকারত অকথ্য অত্যাচার শুরু করেছে জনসাধারণের ওপর। অসমের মায়ং অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীরা বৃটিশের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন শুরু করে এবং এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার রেলপথ ধ্বংস করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করে।

আলোচ্য উপন্যাসে দেখি গোঁসাই, ধনপুর, মধু, জয়রাম প্রভৃতি অত্যন্ত সাহসী কয়েকজন বিপ্লবী নেতা এই কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করেন। এখানে সম্ভবত আন্দোলনকারীরা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির বিপরীতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে সংঘটিত সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা বেশি মাত্রায় প্রভাবিত হয়েছেন । এই উপন্যাসের অনেক চরিত্র যেমন মহদা গোঁসাই, মধু, রূপনারায়ণ, দধি প্রভৃতি বেশ কিছু চরিত্র বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। ফলে ধর্মীয়ভাবে তারা অহিংসপন্থী। তবু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। মধ্য অসমের নঁগাও, কামপুর, বরছলা, মায়ং প্রভৃতি অঞ্চলের বাস্তব ইতিহাসের কাহিনি এখানে বর্ণনা করেছেন লেখক। ভূমিকাতে তিনি নিজে বলেছেন যে, এই উপন্যাসের বর্ণিত ঘটনাকাল ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ। চরিত্রগুলো কাল্পনিক। অবশ্য এখানে স্বাধীনতার এই শেষ আন্দোলনের চিরস্মরণীয় ঘটনাগুলির আভাস ও চিত্রণ আছে। এটি ইতিহাস নয়। নিজের সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে রচিত কাহিনি। এখানে ধারাবাহিক কোনো ঘটনা নেই। ধনপুর ও গোসাই নামের ব্যক্তি দুজনের নেতৃত্বে কীভাবে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি সহকারে ইংরেজ শূন্য ভর্তি রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করা হয় এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে জনসাধারণ কীভাবে দুর্দশা ভোগ করে তার চিত্র এর কাহিনি।

৮.৫ 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্র ভাবনা : অনুদিত গ্রন্থের আলোকে

ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাস একটি বিশেষ সময়ের উপমহাদেশীয় দেশীয় আন্দোলনের ঘটনার ফলশ্রুতি। তাই উপন্যাসের কাহিনি ভাগ এরকম- এখানে ধনপুর গোঁসাই সাথী নামের দুজন স্বাধীনতাকামী ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিকল্পনা করা হয় যে, মায়াং এ ইংরেজ সৈন্য ভর্তি রেলগাড়ি কীভাবে আটকানো যায়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রিটিশকে বিভিন্ন স্থানে বাহিনী প্রেরণ করতে বাধা দান করা। উপন্যাসিক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য ঘটনাকে অর্থাৎ রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করাকে অবলম্বন করে সমসাময়িক বৃহত্তর নঁগাও জেলার মিসিং জনগোষ্ঠীর সামাজিক- পারিবারিক- সাংস্কৃতিক ইত্যাদি দিকসমূহ অংকন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এরমধ্যে যেসব চিত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এগুলো বেশিরভাগই ইংরেজ সরকারের সাধারণ মানুষের উপর করা অমানুষিক নির্যাতন এবং অত্যাচারের চিত্র। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি যে ধনপুর নিজের সহযোগী ভিভিরামকে সুভদ্রা নামের একটি মিসিং মেয়ের ওপর ইংরেজ সেনার পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনা করছে। সেই সময় অসমের বিভিন্ন জায়গায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শান্তিসেনা গঠন করা হয়েছিল। আর এই শান্তিসেনার সদস্যদের ধরার জন্য নির্বিবাদ অত্যাচার চালিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। তারা বহু নারীর সতীত্ব নাশ করেছিল, ধর্ষণ করে হত্যা করে ফেলে দিয়েছিল তাদের। এই সময় একদিন রাত্রে দশজন ব্রিটিশ সৈন্য সুভদ্রাকে বলাৎকার করেছিল। সেদিন রাতে তার বুড়ো মায়ের সঙ্গে সে ঘরে একা ছিল, পুরুষেরা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল পুলিশের ভয়ে। ঘরে কেউ না থাকায় সুযোগে সুভদ্রকে বলাৎকার করে ইংরেজ সৈনিক। সেই ঘটনার বর্ণনা করেছেন লেখক ধনপুরের মুখ দিয়ে- "কলীদিদিকে দেখেই বুড়ি, 'দ্যাখ, আমার সব গেল রে, সব গেল'

বলে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। বুড়িকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল কলীদিদি। আমার কাজ বাইরে পাহারা দেয়া। ওঁরা দুজন ফিসফিসিয়ে কথা বললে কিছুক্ষণ। কী কথা হল। জানি না। এরপর একটি মেয়েকে বের করে নিয়ে এল দিদি। ফ্যাকাশে মুখ, ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া দৃষ্টি। কাপড়ে রক্তের দাগ। পা ফেলতে পারছে না, কাতরাচ্ছে। বিহুলের মত আমিও তাকিয়ে আছি। বুড়ি কাঁদছে আর বলছে- পারবি না একে বাঁচাতে? কাল শেষ রাত থেকে পথের দিকে তাকিয়ে আছি। একটা লোকের মুখ দেখতে পাই নি। ঠাকুর তোকে পাঠিয়েছেন।" (মৃত্যুঞ্জয়, পৃ, ৮)

ধনপুর 'কলি' নামের একজন মহিলার সঙ্গে গিয়ে সুভদ্রার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাকে সাময়িক সুস্থ করে তুললেও অবশেষে সুভদ্রা সতীত্ব নাশ হবার কলঙ্কের ভয় এবং সামাজিক অপযশের আশঙ্কায় গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করে। তবে শুধু যে ইংরেজরাই সাধারণ মানুষকে অত্যাচার করেছিল এমন নয়, বহু স্বদেশী স্বার্থন্বেষী ইংরেজদের পদলেহনকারী দেশদ্রোহীও নিজের অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নানা ভাবে অত্যাচার করেছিল। উপন্যাসে দেখি এদের মধ্যে শইকীয়া, লয়ারাম প্রভৃতিরা রয়েছে। এরাও বহু নারীকে এবং সাধারণ মানুষকে নানা ভাবে অসম্মান, অত্যাচার করেছিল। একবার এরা দুজন ডিমি নামের একজন মহিলাকে বলাৎকারের প্রয়াস করছে দেখা যায়। মায়াঙে একটি স্কুল ছিল যদিও স্কুলের অবস্থা ছিল শোচনীয়। কারণ শিক্ষক নেই, ফেরার। ছাত্র-ছাত্রী যে কজন ছিল তারা ছাড়া পেয়ে ঘুরে ফিরছে। এই দেশের এমন অবস্থায় অভিভাবকদেরও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার দিকে মন নেই কারণ ঘরে ঠিকমত খাওয়াই তো জোটে না। ফলে কখনো কখনো তারা খালি পেটে স্কুলে পড়তে যায়। আবার যেদিন মাঠে চারা বপন করা হয়, সেদিন পরিবারের মা, বাবা, ছেলে, মেয়ে সবাই ব্যস্ত থাকে কারণ ধান বপন না করলে ভাতের জোগাড় সম্ভব নয়। আমরা দেখি বানেশ্বর রাজা, আহিনা কুমারের ছেলেরো এই অবস্থা। এমন অভাবে চলার অভ্যাস যাদের, তাদের ঘরের মেয়েদের তো স্কুলে পাঠানোর অভ্যাসই নেই।

মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাস এর অনুবাদক বলেছেন যে— "ছোট ছোট ঘটনা ও বহু চরিত্রের সমবায়ে উপন্যাসটি রচিত। প্রায় আঠারোটি পুরুষ সাতটি নারীচরিত্রের আশ্রয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এরা অনেকেই গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকে স্বভাব-স্বতন্ত্র।" (অনুবাদকের কথা, পৃ, অনুল্লেখিত) এই উপন্যাসের চরিত্রদের মধ্যে একজন অন্যতম প্রধান চরিত্র মহদানন্দ গোস্বামী, যাকে সবাই জানে মহদা গোঁসাই নামে। তিনি এই উপন্যাসে সশস্ত্র সংগ্রামীদের নায়ক এবং পাশাপাশি অসমের বৈষ্ণব ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি। তিনি দৈপারা নামে একটি সত্রের সত্রাধিকার। ঔপন্যাসিক তার শারীরিক বর্ণনা দিয়েছেন উপন্যাসে— "... লোকটির বয়স ত্রিশেক; লম্বা; গায়ে মোটা খদ্দরের কুর্তা; মুখখানা সুন্দর, রং ফর্সা; চুল পেছন দিকে আঁচড়ান, খোঁপা বাঁধা। নাকটা ধারাল বলা চলে, উজ্জ্বল দুটি চোখের তারা আলকাতরার মত কুচকুচে কালো।" (মৃত্যুঞ্জয়, পৃ, ২০) মহদানন্দ গোঁসাই চৈতন্য পন্থী তবে সমানভাবেই তিনি মহাপ্রভু শঙ্করদেবের আদর্শেও বিশ্বাসী। কারণ পথ নানারকম হলেও লক্ষ কিন্তু একটাই অর্থাৎ সব পথই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর জন্য। তাঁর মতে ধর্ম নিজের নিজের এবং নিজে আচরণ করে ধর্ম শিক্ষা করতে হয়। 'বড় পিঁড়িতে বসে ছিলেন গোসাই, সবই শুনছিলেন। হেসে বললেন, পথ নানা, লক্ষ

কিন্তু এক আর একটা কথা বরা। হয়েও মহাপুরুষ শঙ্করদেবকে মান্য করি। ধর্ম নিয়ে তর্কটা অনর্থক। আমি চৈতনাপন্থী, মহাপ্রভু ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন:

আপনি আচরি ধর্ম সবারে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।।

-ধর্মটা নিজের। কিন্তু পরাধীন জাতির ধর্ম কই? প্রকৃত ধার্মিক ঈশ্বর ছাড়া আর কারো কাছে নত হন না। মহাত্মাজিও বৈষ্ণব। কিন্তু তিনি গণশক্তির পূজক। এই দরিদ্রনারায়ণের বেশেই ঈশ্বর এসেছেন। দেশ স্বাধীন না হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন না।" (পৃ, ২১) এহেন গোঁসাইয়ের প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জন করা। মানবধর্মেই তার আস্থা। কুসংস্কার মুক্ত মহদা গোঁসাই দেশের জন্য হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হতে পিছপা হননি। অবশ্য তার মনে নিজস্ব অহিংসা নীতি থেকে সরে এসে হিংসাত্মক কার্যকলাপ এটা আত্ম সংকটের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সত্রাধিকার হয়েও হাতে বন্দুক তুলে নিয়ে আধ্যাত্মিক দর্শনচ্যুত হওয়া এবং গান্ধীজীর অহিংস-দর্শন থেকে দূরে সরে আসায় তাঁর মনে প্রকট হয়েছে মানসিক দ্বন্দ্ব। ভারতবর্ষের সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যখন জেলে বন্দী, তখন ভারতের বাইরে নেতাজি সুভাষ বসুর নেতৃত্বে যে সশস্ত্র আন্দোলন তৈরি হয়েছিল ভারতবর্ষের ভেতরে সে আন্দোলন যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। সেইরকম রণকৌশলে আসামের বিভিন্ন জায়গায় ব্রিজ ভাঙ্গা, রেল লাইন তুলে ফেলা, বিমান ঘাঁটি জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ধ্বংসাত্বক কার্য সংঘটিত হয়েছিল। এগুলো করতে গিয়ে গোঁসাইয়ের মন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বারবার। তাঁর মনে হয়েছে যে মানুষ না মেরে যদি যুদ্ধ করা যেত তাহলে কতই না ভালো হতো। মহাত্মা গান্ধী জেলের বাইরে থাকলে হয়তো এটা সম্ভব হতেও পারতো।

গোঁসাইর মনে কীর্তন এর দায়রা অতিক্রম করে দেশ ও সংগ্রামের কাজে আত্মোৎসর্গ করার পথ বেছে নেওয়ার ফলে যে আত্মদ্বন্দ্বের জন্ম তা হিংসা এবং অহিংসার কোনটি সঠিক পথ সেটি বেছে নেওয়ার দ্বন্দ্ব। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের প্রাণ নিতে যদি হয়, এইজন্য নিজেকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ এই যুদ্ধতো দেশহিতের জন্য। স্বয়ং কৃষ্ণকেও মাঝে মাঝে সুদর্শন চক্র ধরতে হয়েছিল। তাই প্রয়োজনে কখনো দুষ্টকে দমন করার জন্য হিংসার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদিও তিনি মানসিক দ্বন্দে জর্জরিত তবুও তার কর্তব্য নিষ্ঠা কোন খামতি নেই দলের বিপর্যয়ের সময় তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়— "রূপনারায়ণের বন্দুক গোসাঁইর বন্দুকের উল্টো দিকে নিশানা করা। মধুর বন্দুক দেখার চেষ্টা করলেন গোসাই। এবার মাখাটা একটু বেশি উঁচু করে সামনের ছাতিম গাছটার ডালের দিকে তাকালেন, মধু শুয়ে আছে। বন্দুকটা নিচের দিকে তাক করা। কারো মুখে টু শব্দটি নেই। তামোল খেতে ইচ্ছে করছে গোঁসাইর। কিন্তু আহিনা কোঁয়রকে ডাকার সাহস হল না। কাউকে ডাক দেয়ার সময় নয় এটা। এ তো গ্রামের জুহাল, বৈঠকখানা বা ধানের খেত নয়, এ যে রণক্ষেত্র। এ সময়ে কথা বলতে নেই। লক্ষ রাখার দরকার হলে লক্ষই রাখতে হবে, গুলি করার দরকার হলে গুলিই করতে হবে। এদিক-ওদিক করা চলবে না। করলেই পরাজয়ের সম্ভাবনা। এও তো এক যুদ্ধ।" (পৃ, ১৩৫) রেল লাইনচ্যুত করার কাজ ঠিকঠাক করলেও পরবর্তীতে নিজের মন তীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে মানসিক সংঘাত তীব্রতর করেছে গোঁসাইয়ের। তিনি স্বীকার করেছেন যে এই কাজ তার সহ্য হয়নি। তার বিবেক বিকল

হয়ে পড়েছে। তিনি বলেছেন যে, তাঁর পক্ষে অহিংস যুদ্ধই ভালো। অহিংসার যুদ্ধই হল আসল যুদ্ধ। এমন মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত দেশের জন্য প্রাণ ত্যাগ করেন গোঁসাই। তার মনে রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি নিজের পত্নীর কথা বারবার স্মরণ করার মধ্যে এক ধরনের সাংসারিক মায়া ও কর্তব্যবোধ এর দ্বন্দ্বও ফুটে উঠেছে। সন্তান সম্ভবা স্ত্রীকে সৈনিকরা ধরে নিয়ে গেছে এই ভাবনা শেষ পর্যন্ত গোঁসাইকে তাড়িত করেছে। সাংসারিক প্রেম ও কর্তব্যবোধের এই দ্বন্দ্বের সংকট মহদাকে ব্যতিব্যস্ত করলেও আবার রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তার নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা তার চরিত্রটিকে যথার্থ মানুষ হিসেবে চিত্রিত করেছে। এই চরিত্র সৃষ্টিতে উপন্যাসিক চূড়ান্ত সার্থকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন বলা যায়।

এই উপন্যাসের অন্যতম একটি চরিত্র রূপনারায়ণ। নিজের পড়াশোনা বাদ দিয়ে দেশ স্বাধীন করার জন্য আন্দোলনে যেসব যুবক সেই সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রূপনারায়ণ তাদের প্রতিনিধি। উপন্যাসের মধ্যভাগে তার দেখা পাওয়া যায় প্রথম। মহদা গোস্বামীর নেতৃত্বে রেল লাইনচ্যুত করার সময় তার কাহিনিতে আগমন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির বিপরীতে নেতাজী সুভাষ বসু, জয়প্রকাশ নারায়ণের আদর্শে আদর্শায়িত হয়ে সে গরিলা যুদ্ধকে সমর্থন করে। রূপনারায়ণের মনে সুভাষ বসুর কথাই ঠিক বলে মনে হয় যে, যুদ্ধ তো করতেই হবে, গরিলা যুদ্ধই করতে হবে শেষ পর্যন্ত। তবে তার মনেও সে এক ধরনের হিংসা ও অহিংসার দ্বন্দ্ব কাজ করে যায় অহরহ। বিশেষ করে যখন সে রেল অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাতে সক্ষম হয় এবং তারপর অজস্র মানুষের রক্ত তার চোখে পড়ে, তখন সে আনন্দ করতে পারেনা। তার মনে হয় যে মানুষের রক্ত হাতে লাগলে আনন্দ করা সম্ভব নয়। যদিও সে নিজের জাতির স্বাধীনতার জন্য নিজস্ব শিক্ষা কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন হেলায় ত্যাগ করেছিল তবুও শেষ পর্যন্ত সেই সশস্ত্র বিপ্লবকে সে সত্য বলে মেনে নিতে পারে না। সে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুবক যুবতীদের মনে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার মনে অহিংস নীতিতে সংগ্রাম করার দুর্বার বাসনা জেগে উঠেছে দেখা যায়। আলোচ্য উপন্যাসে সে একজন শক্তিশালী, ত্যাগী, শিক্ষিত উদার যুবক চরিত্র হিসেবে চিত্রিত যে তার জীবনের লক্ষ্যের জন্য নিজের প্রেমিকাকেও বিসর্জন দিয়েছে।

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র ধনপুর, যাকে আমরা উপন্যাসের নায়ক হিসেবে একপ্রকার চিহ্নিত করতে পারি। সে মিসিং সম্প্রদায়ের মানুষ। বাস্তবতায় বিশ্বাসী, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। জনসাধারণের মনে অন্ধবিশ্বাস কিংবা কুসংস্কার রয়েছে সেগুলি এখন সে বিশ্বাস করে না যদিও একসময় সে বিশ্বাস করত। যখন সে ডিমি নামের একটি মেয়েকে ভালোবাসতো তখন সেই মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য সে দেবতাকে একটা কালো পাঠা উৎসর্গ করেছিল। ভিভিরামের সঙ্গে ধনপুরের কথোপকথনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ধনপুর লস্কর তরুণ ২০ বৎসরের যুবক। ঔপন্যাসিক তার সম্পর্কে এভাবে বলেছেন—"ধনপুর লস্কর টগবগে যুবক। বাতাবি লেবুর মত গোল মুখে কুচকুচে কালো গোঁফ। ব্যাকব্রাশ চুল। ওই সঙ্গে ওর বিশাল শক্তিশালী শরীরটার অবিস্মরণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বড় বড় দুটি চোখের দৃষ্টি। ওই দৃষ্টিতে মনে হয় যেন প্রলয়ের আগুন জ্বলছে। অনেক চেষ্টা করেও হাইস্কুলের গণ্ডি পেরতে পারল না ধনপুর। ধূমপানে আসক্ত অথচ ধাবমান গ্রহের মত সদাসচল এই

তরুণটির মনের কোণে একটু করে আগুন বাসা বেঁধে আছে। ওর ওই গোপন ব্যাখার আগুন কারো চোখে পড়েনি কোনোদিন।" (পৃ, ১) এই উপন্যাসে ধনপুর একজন মানবতাবাদী স্বদেশপ্রেমিক যুক্তিবাদী কুসংস্কারমুক্ত উদার ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপিত। আন্দোলনের সময় ইংরেজ দ্বারা অত্যাচারিত লোককে সেবা করা, সুভদ্রার মত অত্যাচারিত নারীকে চিকিৎসা সেবার দ্বারা সুস্থ করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া এই সব কাজ তাকে একজন সাধারণ মানুষের থেকে উন্নততর মানুষ বলে সূচিত করে। তার দেশপ্রেমের পরিচয় আমরা পাই গোঁসাই ও রূপনারায়ণের সঙ্গে মিলে ইংরেজ সৈনিক ভর্তি রেলগাড়ি উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা কিংবা বিভিন্নভাবে আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করার মধ্যে। দেশকে স্বাধীন করার জন্য এমনকি সে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতেও পিছপা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সৈনিকের গুলিতে প্রাণ ত্যাগ করেছে। তার উদার মনের পরিচয় আমরা পাই তখন যখন সে সুভদ্রা সম্পর্কে সমস্ত কিছু জেনেও তাকে বিয়ে করার জন্য এগিয়ে এসেছে। ১০ জন অত্যাচারী ব্রিটিশ সৈনিকের দ্বারা বলাৎকার হওয়া সুভদ্রা সমাজের দৃষ্টিতে কলঙ্কিনী, কিন্তু এমন একটি নির্যাতিতা নারীকে বিয়ে করতে চেয়ে সে মানবমনের উদারতা প্রকাশ করেছে। সুভদ্রাকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করার পূর্বে সে একটি কারবি মেয়ে ডিমির প্রেমে পড়েছিল। তাকে মনে মনে চেয়েওছিল বিয়ে করার জন্য। কিন্তু ডিমির বিয়ে একটি গারো ছেলের সঙ্গে ঠিক হয়েছিল। পরবর্তীতে তাই ডিমিকে বিয়ে করার ইচ্ছে পরিত্যাগ করে। ডিমিকে যখন ভালোবেসেছিল তখন ধনপুর একজন কুসংস্কারগ্রস্থ মানুষ ছিল, কেননা আমরা দেখি যে ডিমিকে লাভ করার জন্য সে কালো পাঁঠা উৎসর্গ করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সে হয়ে উঠেছিল একজন সংস্কারমনস্ক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। পরম্পরাগত সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাকে আমরা বারবার বিপ্লবী মতামত পোষণ করতে দেখি। ভগবান সম্পর্কে সে বলে—"ধনপুর বলল, আমি একজন মানুষ, ভক্ত নই। ভগবান কোথায় আছেন দেখিনি। অত্যাচার হলেও তিনি দেখা দেন না। একটি যুবতী মেয়েকে মিলিটারির দল অত্যাচার করল, তিনি বেরিয়ে এলেন না। আর থেকে থাকলেও উনি হয় অন্ধ, নয়ত কালা।" (পৃ, ২২) আবার দধি বরদলৈ যখন বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের গুণগান করে গান গাইলো তখন ধনপুর তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল যে, ভগবান কোথায় আছেন তুমি কি দেখাতে পারো। যদি পারো তাহলে বিশ্বাস করব। তোমাদের এখানে তো মন্ত্র তন্ত্র জানা লোক আছে, যদি পারো তো দেখাও? (পৃ,২২)

উপন্যাসের নারী চরিত্রদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ডিমি। সে কারবি সম্প্রদায়ের নারী। তারা বেশ গরিব। ফলে মা এর সঙ্গে কার্পাস, সুপুরি, সরু সরু ধান ইত্যাদি বিক্রি করার জন্য মাঝে মাঝে কামপুর আসে নদী পেরিয়ে। ঔপন্যাসিক তার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন— "প্রায়ই কার্পাস নিয়ে আসে ওই যুবতী। কখনও ভিভিরামের বাড়িতেও থাকে। সঙ্গে আসে এক বুড়ি, ওর মা। ওদের সঙ্গে আরো জিনিসপত্র থাকলে কখনও বা হাটে বসে পড়ে। কখনও কখনও এক ধরনের সরু সরু ধান নিয়ে আসে, গরম জলে ভিজিয়ে খেতে চমৎকার লাগে। কখনও আনে গালা গাছের থেকে তোলা আঠার ডেলা। যুবতীটি ফর্সা। ওর সুঠাম শরীরে পায়ের গোছদুটো অপূর্ব সুন্দর। পায়ের গোছের এমন চমৎকার গড়ন অসমীয়া মেয়েদের মধ্যে দেখাই যায় না। ওর নাম ডিমি, ওর মায়ের নাম কাদম। গলায় 'লেক', কানে 'কাদেং সিনরো' হাতে 'রয়', কোমর ঘিরে রংচঙে 'পীনি', বুকের ওপর 'জীসো' (নামগুলো ধনপুর জিজ্ঞেস করে করে জেনে নিয়েছিল) পরে ডিমি আসত। ওর মায়ের পরনে থাকত শুধু 'পীনি' আর

'ভীসো'। কখনও বা ওরা আদা, লঙ্কা আর কমলালেবু দিয়ে যেত। ডিমির মা ওকে কোনো এক রাতে ভিভিরামের ওখানেই আগুনের পাশে বসে শরৎকুমারের গল্প শুনিয়েছিল।" (পৃ. ২)

ডিমি চরিত্রটি এই উপন্যাসের অনেকটুকু জুড়ে আছে। আমরা দেখি যে ডিমি বেশিরভাগ সময় ধনপুরের কাছাকাছি থাকে, তাকে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উৎসাহ যোগায়। ধনপুরের মনকে উৎসাহ যুগিয়ে আন্দোলনে তার ভূমিকা বাড়িয়ে তুলতে অনেকটা ভূমিকা নিয়েছে ডিমি। সে নিজে স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবনে অনেকটা দুর্ভোগ সহ্য করেছে, এমনকি জেলেও গেছে। একটি গারো জনগোষ্ঠীর ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তবু সে বিপ্লবের আগুন তার মন থেকে দূর হতে দেয়নি। নিজের ভাইয়ের মতোই ধনপুরকে স্নেহ করে সে। যখন ধনপুর গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্ধকারে জঙ্গলে একাই যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে, তখন ডিমি সেই খবর পেয়ে সেখানে যায় আর তার মাথা নিজের কোলে তুলে নেয়। তার কোলেই ধনপুর শায়িত হয় চিরনিদ্রায়।

উপন্যাসে মায়াং অঞ্চলের যাদুবিদ্যার প্রসঙ্গ কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। অতীতে মায়াং অঞ্চলের মানুষ জাদু মন্ত্রে অত্যন্ত দক্ষ ছিল বলে শোনা যায়। তারা জাদুবিদ্যা দিয়ে মানুষকে ভেড়াতে রূপান্তর করতে জানতো। জয়রাম বলে চরিত্রকে আমরা দেখি, যে, সে নিজেই গর্ব করে বলে যে একসময় সেও একজন জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি ছিল। কিন্তু কংগ্রেসে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী হবার পর সে মন্ত্র বিদ্যা ছেড়ে দিয়েছে। সে গর্ব করে বলে যে গোঁসাই যদি তাকে কংগ্রেসের কাজে লাগিয়ে না দিতেন, তাহলে একটা পিড়িতেই সে ধনপুরকে আটকে রেখে দিতে পারতো। মানুষের মনে মঙ্গল-অমঙ্গল এর আশঙ্কা প্রকৃতি থেকে অনেক সময় ইসিতে পাওয়া যায় বলে এদের ধারণা । তাই দেখি গোঁসাই পত্নী বলেন, যে তাঁর মন বলছে কিছু একটা অঘটন ঘটবে কারণ সুভদ্রা আত্মহত্যা করার ফলে তার আত্মা শয়তান হয়েছে এবং রাত্রিতে হরিণ পশুর মত কাঁদে। আর এই কান্না অমঙ্গলের বার্তাবহ। এভাবে স্থানীয় মানুষের বেশ কিছু সংস্কার বিশ্বাস এই উপন্যাসে উল্লেখিত হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসে যে নারী সমাজের দেখা পাওয়া যায় তারা ছিলেন স্বরাজ লাভের পক্ষপাতী কনকলতা ঢেকীয়াজুলি তেঁতুলের মত অনেক সাহসী ও বিপ্লবী নারী শহীদ হওয়ার কাহিনি মৃত্যুঞ্জয়কে বাস্তবধর্মী উপাদানে সমৃদ্ধ করেছে সম্ভবত তাই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপন লক্ষ করে অধ্যাপক সমালোচক গোবিন্দ প্রসাদ শর্মা বলেছেন যে, এই উপন্যাসে সমসাময়িক ও ঐতিহাসিকভাবে সত্য অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে এইগুলো উপন্যাসের বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে। তিলক ডেকা ভোগেশ্বরী ফুকননী ... কীভাবে সরভোগের একটি স্থান জ্বালিয়ে দিলেন... কনকলতা ...কুশল কোঁওরকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসি দেওয়া হল... স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ের সময়টুকুর বাস্তব ঘটনা উপন্যাসের পাতায় নামিয়ে এনে এই উপন্যাসের কাহিনী রাজনৈতিক পটভূমি তৈয়ারি করেছেন লেখক।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণটিকে নিজের ভাষায় লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৮.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

'মৃত্যুঞ্জয়'-এর কাহিনি সত্য ঘটনার ওপর আধারিত। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে অসম প্রদেশে সশস্ত্র বিপ্লবীরা কীভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তার এক দৃষ্টান্ত এবং প্রাসঙ্গিক ছোট ছোট ঘটনা ও বহু চরিত্রের সমবায়ে উপন্যাসটি রচিত। প্রায় আঠারোটি পুরুষ ও সাতটি নারীচরিত্রের আশ্রয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এরা অনেকেই গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের স্বভাব-স্বতন্ত্র। চরিত্রের মূল মানুষগুলির কেউ কেউ এখনো বেঁচে আছেন। বীরেন্দ্রকুমার দেখা জিনিসটাই আঁকতে বেশি অভ্যস্ত এমন একটা কথা শোনা যায়। তিনি নিজে বলেন, তাঁর দেখা চরিত্রগুলো শুধু অবলম্বন হিসাবে আসে। লিখতে গেলে শেষ পর্যন্ত গোল হয়ে যায় চৌকো, চৌকো হয়ে যায় গোল। মূল থেকে ওরা সরে আসে অনেক, অনেকটাই। তাই উপন্যাসের কাহিনির পাশাপাশি চরিত্ররাও পাঠকদের বেঁধে রাখতে সক্ষম। উপন্যাসে ওই বেঁধে রাখার ক্ষেত্রে নরনারী চরিত্র ছাড়াও আরো চরিত্র আছে। উপন্যাসের বৃহৎ ঐকতানে এদের ভূমিকা মনে গভীর রেখাপাত করে। বিভিন্ন মানুষ, পাখি, নদনদী, বৃক্ষরাশি— এরা সবাই 'মৃত্যুঞ্জয়'-এর চরিত্র। যাঁরা একটি বিশেষ সময়কেই প্রকারন্তরে রূপ দিতে উন্মুখ।

৮.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা সর্বপ্রথমে আসামের ধ্রুপদী জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের সামগ্রিক অবয়ব সম্পর্কে জানা সম্ভব হলো। এছাড়া—

- মানব সমাজ অনর্ভূক্ত যেকোন ব্যক্তিবিশেষই যে দেশীয় রাজনীতির বৃত্তে আবর্তীত তার প্রমাণ এ নাটকে বর্তমান।
- অসমীয়া সমাজবাস্তবতার সংক্ষিপ্ত চেহারা সম্পর্কে অবগত হতে পারলেন।
- উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রের পূর্ণঙ্গ পরিচয় পাওয়া গেল।

৮.৮ অতিরিক্ত পঠন

- কটকী, ড.প্রফুল্ল (১৯৮৯); স্বরাজোত্তর অসমীয়া উপন্যাস সমীক্ষা; গুয়াহাটি : বীণা লাইব্রেরী
- খাউণ্ড, ড. মলয়া (২০১৮); বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য আরু তেওঁৰ উপন্যাস; গুয়াহাটি : সাহিত্য প্রকাশ

- ঠাকুর, নগেন (সম্পা) (২০০০); এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাস; পানবাজার; গুয়াহাটি : জ্যোতি প্রকাশন
- ভট্টাচার্য,বীরেন্দ্র কুমার (২০১৫) মৃত্যুঞ্জয়; অনুবাদ ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য, কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি
- শর্মা, ড. গোবিন্দ প্রসাদ (১৯৯৫); উপন্যাস আরু অসমীয়া উপন্যাস; গুয়াহাটি : স্টুডেন্টস স্টোরস
- শর্মা, ড. সত্যেন্দ্রনাথ (১৯৮৬); অসমীয়া উপন্যাসর গতিধারা; গুয়াহাটি : বাণী প্রকাশ
- শর্মা, ড.সত্যেন্দ্রনাথ (১৯৬৫); অসমীয়া উপন্যাসর ভূমিকা; কলকাতা : অসম বুক ডিপো

৮.৯ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (১৪ই অক্টোবর ১৯২৪ – ৬ই আগস্ট ১৯৯৮) ছিলেন আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ।.....তিনি কুড়িটি উপন্যাস, ছয়টি ছোটগল্প, প্রায় একশোটি কবিতা এবং অসংখ্য প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেছেন.....এই বিষয়ে আরো লিখে উত্তর সম্পূর্ণ করুন। (দ্রষ্টব্য ৮.৩ অংশ)

২। উপন্যাসের কাহিনি ভাগ এরকম- এখানে ধনপুর গোঁসাই সাথী নামের দুজন স্বাধীনতাকামী ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিকল্পনা করা হয় যে, মায়াং এ ইংরেজ সৈন্য ভর্তি রেলগাড়ি কীভাবে আটকানো যায়।.....এভাবে সম্পূর্ণ কাহিনি অংশ আলোচনা করতে হবে। (দ্রষ্টব্য ৮.৫ অংশ)

৮.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট বিষয়ে আলোকপাত করুন।

২। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩। 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণের দিকটিকে নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৪। 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসে যে সমাজবাস্তবতার চিত্র ফুটে ওঠে সে বিষয়টি নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লিখুন।

৫। 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাস প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য বিষয়ে লিখুন।

*** *** ***